দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ...

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

শিক্ষা সংস্কারের বিরোধিতা প্রসঙ্গে

ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ

শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে এর পূর্বে যে সকল প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তার মূল কথা হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তিমূল পরিবর্তন করতে হবে, কারণ আধুনিক যে শিক্ষা আমরা দান করছি তার ভিত্তি হচ্ছে 'পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ' এই ধারণার উপর স্থাপিত। সেই ধারণার ভিত্তিতেই রাজনীতি শাস্ত্র, অর্থ শাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান এই সমস্ত বিষয় পাশ্চাত্যে গড়ে উঠেছে। ফলত : এই সমস্ত বিষয়ের সংগে চিরন্তণ মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা এই ধারণা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহির্গত হয় যে, ধর্ম জীবন সম্বন্ধে যে বাঁধাধরা জীবন পদ্ধতির কথা বলে তার সংগে পরিবর্তনশীল যুগের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং যে চিরন্তন মূল্যবোধকে রক্ষার জন্য জীবনের মানদণ্ডকে ধর্ম অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করে সেই মূল্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কারণ বিজ্ঞানের মারফত মানুষ অসম্ভব পার্থিব শক্তি অর্জন করেছে। কিন্তু আমি দেখেছি যে, আধুনিক শিক্ষাবিদদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞানের এই ক্ষমতায় মোহিত হয়ে বিজ্ঞানের আদর্শকে মানুষের উপর প্রয়োগ করেছেন এবং বিজ্ঞানের মারফত যে প্র্যাগম্যাটিজম, এমপিরিসিজম এবং র‍্যাশনালিজমের প্রচার এবং প্রসার ঘটেছে— তাকেই মানবউন্নতির এবং জ্ঞানার্জনের একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করেছে। অথচ বৈজ্ঞানিকেরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, যেহেতু থিওরীর মারফত যতটুকু যতদিন সত্য বলে বিবেচিত হয় ততটাই ততদিন সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং থিওরীর পরিবর্তন হলে পুরোনো সত্য মিথ্যায় পরিণত হয়। সুতরাং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতিকেই একমাত্র-সম্বল করলে আমরা এই ধারণায় আসতে বাধ্য যে, 'সত্য' বলে কোন বস্তুই নেই। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তার **Impact of Science on Soeiety** বইতে বিজ্ঞানের এই ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। অর্থাৎ ধর্মের মারফত যে অন্য পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং সত্য সম্বন্ধে অভিহিতি জন্মে তাকেও শিক্ষার্থীরা অবিশ্বাস করতে শেখে। তাই বলেছিলাম যে, বিজ্ঞান যে ধ্যান-ধারণা এবং পদ্ধতি দিচ্ছে তা সামাজিক উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হলেও তাকেই একমাত্র সত্য পদ্ধতি বলে গণ্য করা ভুল। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যের শিক্ষাক্রমের, পাঠ্যপুস্তকের এবং শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তিমূলের পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

শিক্ষার এই সংস্কার বিরোধী লোক এদেশেও রয়েছে। এদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দল হচ্ছে সেই ধরনের ইসলামী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি· যারা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সেকুলারিস্ট দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা নতুনভাবে চিন্তা করতেও আগ্রহী নন, তারা যেমন ব্যাংকের সুদ নেয়া সেভিংসে টাকা রাখা বা ব্যবসায়ে যে সমস্ত সুদের ব্যবস্থা আছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছেন এবং সে সব গ্রহণ করেছেন তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার যে সমস্ত জ্ঞান পরিবেশিত হচ্ছে তার উৎসমূলে যে সেকুলারিস্ট ধ্যান ধারণা রয়েছে তাকেও সহজভাবে মেনে নিচ্ছেন। এতটা তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এই সমস্ত চিন্তাধারা সম্বন্ধে যে তাদের মনোবৃত্তিই অনেকটা সেকুলারিস্ট হয়ে গেছে এবং রাজনীতি, অর্থনীতি অনেক কিছুতেই ইসলাম বিরোধী বা ধর্ম বিরোধী ভাবধারার সন্ধান পান না। এরাই হচ্ছেন ম্যাকলের 'ব্রাউন ইংলিশম্যান'। পাশ্চাত্য জগতের সেকুলারিস্ট শিক্ষাবিদরা জ্ঞান সম্পর্কে সেকুলারিস্ট ধারা ছাড়াও যে বিশেষ ধর্মীয় ধারা বিদ্যমান আছে তা মেনে নিয়েছেন এবং ইসলামের অবশিষ্ট দৃষ্টিভংগি এবং চ্যালেঞ্জকে সত্যভিত্তিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন— অথচ আমাদের ব্রাউন ইংলিশ ম্যানদের মস্তিষ্ক এত কঠিনভাবে বিধৌত হয়েছে যে, তারা মনে করেন আধুনিক রাজনীতির অর্থনীতির বিজ্ঞানের অর্থাৎ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলে যে দৃষ্টিভংগি জীবন দর্শন রয়েছে তা মোটেই ইসলাম বিরোধী নয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাদের কথা দোষের মনে হয় না, কারণ তারা বলেন যে, বিজ্ঞান বিজ্ঞানই, ইসলামিক বা অনৈসলামিক বিজ্ঞান বলতে কিছু নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে যে দৃষ্টিভংগি রয়েছে তাকে সমালোচনা করলে মনে করেন, 'এ হচ্ছে বিজ্ঞান বিরোধী সমালোচনা এবং মানুষকে ব্যাকওয়ার্ড বানানোর চেষ্টা। এই জ্ঞান অর্জন না করলে আমাদের চলবে কি করে? বিজ্ঞান এবং টেকনোলজি ছাড়া আমরা পশ্চাদপদ হয়ে থাকব। কিন্তু তারা ভুলে যান যে, বিজ্ঞান এবং টেকনোলজি শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন সেই দৃষ্টিভংগির বিরুদ্ধে কথা বলার, যে দৃষ্টিভংগি অনেক বৈজ্ঞানিকেরা প্রচার করেছেন এবং অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক গ্রহণ করে সমাজে চালু করেছেন শিক্ষার মাধ্যমে। তার মূলে রয়েছে আত্মার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা, মানুষের বুদ্ধিকেই সত্য জানার একমাত্র পথ বলে মনে করা এবং একমাত্র বুদ্ধির মারফত মানুষকে এবং সমাজকে বোঝার চেষ্টা করা। ফলে আল্লাহদত্ত যে মূল্যবোধের মানদণ্ড মানবাত্মার প্রোথিত বলে ধর্ম শিক্ষা দেয় তাকে অবিশ্বাস করে এই বিশ্বাস প্রচার করা যে, পরিবর্তনশীল সমাজই এ মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে সুতরাং চিরন্তন কোন মূল্যবোধ নেই। সমাজের পরির্তনের সংগে সংগে তাই মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে বাধ্য। বুদ্ধি দ্বারাই একমাত্র যে মানদণ্ড গ্রহণ করা যায় তাকে গ্রহণ করতে হবে। আমরা 'শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়' প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে, একই থিওরীর ফলে বুদ্ধিপ্রণীত থিওরীর মারফত বুদ্ধিপ্রণীত থিওরীকে অবিশ্বাস করতে শিখেছি। অর্থাৎ এক থিওরী যাকে 'সত্য' বলে নতুন থিওরী এসে তাকে 'বাতিল' করে এবং সেই থিওরীকে মিথ্যায় পরিণত করে। বুদ্ধির অতীত যে জ্ঞান অর্জনের অন্য কোন পথ আছে তা আমরা অবিশ্বাস করতে শিখেছি। তাই আমরা আজ বুদ্ধিকেও অবিশ্বাস করছি। ফলে আমরা জানি না আমরা কে বা কি বা কোথায়। সেন্ট জনস কলেজে (কেম্ব্রিজে) ১৯৮৭ সালে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এক সম্মেলনে যোগ দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। তারা বিজ্ঞান সাধনার মূলে ধারণার ফলাফলের কথা বলতে যেয়ে বলেছেন যে, জ্ঞান অর্জনের যে আত্মিক পদ্ধতির কথা ধর্ম বলে সেই পথের সন্ধান করা প্রয়োজন, নচেৎ মানুষ তার নিজের সত্তা সম্বন্ধেই বিভ্রান্ত হবে– ফলে মনুষ্যত্বের চিরন্তন মানদণ্ড বলে কিছু থাকবে না। এই প্রথম দলের লোকেরা বিজ্ঞান আমাদেরকে কি দিয়েছে তার দিকে বারম্বার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং বিজ্ঞান যে থিওরীকে সত্য বলে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে সে কথা হয় লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছেন অথবা সে সম্বন্ধে অজ্ঞ বা তা এড়িয়ে বিজ্ঞানজনিত পার্থিব উন্নতির দিকে দৃষ্টিকে ঘুরিয় দিয়ে বলছেন, বিজ্ঞান বিজ্ঞানই, ইসলামী বিজ্ঞান আবার কি? বিজ্ঞানের আবিষ্কার কিভাবে ব্যবহার করব তা সমাজের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সমাজকে ঠিক করতে বলছেন। অথচ মানুষ সম্বন্ধে যে ধারণা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের মারফত সমাজে চালু করা হয়েছে এবং যে ধারণার বিরুদ্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল থেকে শুরু করে অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকরাই খড়্গহস্ত হয়েছেন সে সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য কিছুই নেই। অর্থাৎ তারা আমাদের শিক্ষাবিদদেরও বিভ্রান্ত করছেন। অথচ আমরা চাচ্ছি এই বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তন করতে এবং বিজ্ঞানের থিওরীর সীমিত সত্যতা সম্বন্ধে লোককে ওয়াকিবহাল করাতে যাতে ধর্মের ভিত্তিমূলে মানবাত্মার যে অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলা হয় এবং মানবতাবোধ যে মূল্যবোধের ভিত্তিমূলে তার চিরন্তনতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বব্যাপী আন্দোলন বিজ্ঞান শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতির বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অক্সফোর্ডে ফারমিংটন ইনস্টিটিউটে খৃষ্টান শিক্ষাবিদরা ইতিমধ্যে বিলেতের জাতীয় শিক্ষাক্রমের সমালোচনা করে নতুন শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতির উপর গবেষণা করিয়ে পুস্তক রচনা করেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতির সংগে মূল্যবোধের সম্পর্কহীনতার বিরুদ্ধে বিলেতের বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতি গত বিশ বৎসর যাবত তুমুল আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্যেই ১৯৮৮ সালে আমরা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আটটি লেকচারের ব্যবস্থা করি—চারটি মুসলিম চিন্তাবিদ দ্বারা এবং চারটি খৃষ্টান চিন্তাবিদ দ্বারা। প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল : **Science Education and Religious Beliefs: Islamic and Christian Approaches** (বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস : ইসলামিক এবং খৃষ্টান দৃষ্টিভংগি)।

চলবে